ছিন্নপত্রের সৌজন্যে

শুভেন্দু পাত্র

এখন থেকে প্রায় পৌনে দুশো বছর আগে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর এক বাড়িতে একটা ছেঁড়া কাগজ অবিশ্বাস্য এক কান্ড ঘটিয়েছিল। উড়ে যেতে যেতে ওটি গৃহস্বামী যুবক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে পড়ে যায়। সে সময় ঈশ্বর-জিজ্ঞাসু দেবেন্দ্রনাথ একটি অমীমাংসিত প্রশ্নে প্রবল মানসিক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও অস্বস্তিতে কাল কাটাচ্ছিলেন– ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? সাধারণ ঔৎসুক্য বশতঃ তিনি ওই কুড়িয়ে পাওয়া ছেঁড়া কাগজটি খুলে দেখলেন, ওতে একটা সংস্কৃত শ্লোক লেখা রয়েছে। তিনি আবিলম্বে সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছ থেকে শ্লোকটির অর্থ জেনে নিলেন। শ্লোকটি ছিল ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং...ইত্যাদি। এই শ্লোক তাঁকে নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী করে তুলেছিলে, তাঁর মনের সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব কেটে গিয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল 'স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম। এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্মের মধ্যে সায় দিল, আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল..." পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর কতিপয় সহযোগী জ্ঞান, যুক্তি ও ভক্তির সমন্বয়ে যে সমাজ বিপ্লব সম্পন্ন করেছিলেন তার সূচনালগ্নে এই ছেঁড়া কাগজটির সামান্য ভূমিকা ছিল বলে মনে করা যায়।

এ ধরনের ঘটনাকে কট্টর যুক্তিবাদীরা নেহাতই কাকতালীয় বলে ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ বিচার বুদ্ধিতে এটি অলৌকিক, অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। মহাকবির সেই বিখ্যাত উক্তি মনে আছে– স্বর্গে ও মর্তে এমন বহু ঘটনা আছে যা তোমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। একটি তুচ্ছ ছেঁড়া কাগজ আমার জীবনেও এক অকল্পনীয় ব্যাপার ঘটিয়েছিল– যা আমার নিজেরও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

না-লেখকের এই লেখাটি যিনি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে পড়তে চাইবেন তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য একটি অশ্রুতপূর্ব নাম মনে রাখতে হবে– মহেন্দ্রনাথ কার? এ নামের অধিকারীর জন্ম হয়েছিল মেদিনীপুর জেলার খেজুরি থানার বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী এক গন্ডগ্রামে তথাকথিত এক 'নিচু জাতে'র পরিবারে। তাঁর সময়ে কলকাতা আসতে সময় লাগত প্রায় তিন দিন, নৌকায়। তিনি কোনোক্রমে বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন। তারপর তাঁর অতিসংক্ষিপ্ত বাকি জীবন কাটিয়েছিলেন জ্ঞানান্বেষণে। নিজের চেষ্টাতেই তিনি ইংরাজি ও চার পাঁচটি ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর চর্চার মূল বিষয় ছিল ইতিহাস। স্বদেশি আন্দোলনে তিনি দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সহযোগী ছিলেন। দেশের যে কোনো অন্যায় অবিচারের, বিশেষ করে তাঁর নিজ সমাজ ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষের লাঞ্ছনা বা অপমানের তিনি অনমনীয় প্রতিবাদী ছিলেন। তাঁর মাত্র উনচল্লিশ বছরের জীবদ্দশায় শেষোক্ত এই বিষয়ে অনেক ঘটনাই ঘটেছিল। কিন্তু আজকের কাহিনির প্রয়োজনে শুধু একটিরই উল্লেখ করতে হবে।

বিগত শতাব্দীতে ১৩২২ বঙ্গাব্দে ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রতি মাসে কিস্তিতে কিস্তিতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' –যা পরে 'শ্রীকান্ত' নামে বই আকারে বেরিয়েছিল– লিখে চলেছিলেন। এরই কোনো এক মাসের লেখায় তথাকথিত অস্পৃশ্য ও নিচু জাত সম্পর্কে কিছু উল্লেখ ছিল– যা পড়ে মহেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল এধরনের উল্লেখ তাঁর এবং অন্য সব নিম্নবগীয়দের পক্ষে অবমাননাকর। তিনি তৎক্ষণাৎ এর প্রতিবাদ করে শরৎচন্দ্রকে চিঠি লেখেন। শরৎচন্দ্র তাঁর চিঠির জবাব দিয়েছিলেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। বই আকারে প্রকাশ করার সময় তিনি ওই অংশটি বাদ দেবেন তাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সূত্রে মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কয়েকবার পত্র বিনিময় হয়েছিল।

মহেন্দ্রনাথ এই লেখকের দাদামশায়। শুধুমাত্র পারিবারিক সূত্রেই আমি এই ঘটনা শুনেছিলাম। মূল চিঠিপত্র আমি কখনোই দেখিনি, দেখা সম্ভবও ছিল না। দাদামশায়ের মৃত্যুর বহুদিন পরে আমার জন্ম, আর বিয়াল্লিশের বিধ্বংসী বন্যায় তাঁর সংগ্রহ করা অসংখ্য দুর্লভ বই-এ ভরা বিশাল লাইব্রেরির কাগজপত্র, পান্ডুলিপি এবং কয়েক সহস্র চিঠি ভেসে গিয়েছিল। যা উদ্ধার হয়েছিল তা ছিল সমুদ্রের নোনা জলে ভেজা জোড়া লাগা কাগজের স্তুপ যা আরো কিছুকাল পরে উই -এর ঢিপিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আমাদের বাড়িও ছিল– এখনও আছে– খেজুরিতে, নন্দীগ্রাম সীমান্তে। আমার বাবা মহাত্মাগান্ধীর একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন, তাঁর সসাময়িক বহু মেদিনীপুরবাসীর মতো তিনি স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষ না থাকলেও তাঁর প্রবল বিদ্যানুরাগ ছিল, সংস্কারমুক্ত মন ছিল, দেশের সব খবরেই তাঁর কৌতূহল ছিল। স্নেহময় মানুষটির সন্তানদের সম্পর্কে অনেক উচ্চাশা ও সাধ ছিল, কিন্তু তা পূরণ করার সাধ্য ছিল না। খুবই স্বাভাবিক যে আমার মা বাবার সংসারে প্রচন্ড অভাব ছিল। ওঁরা চাইলেও আমার পড়াশুনা অব্যাহত গতিতে হয়ে ওঠেনি। বাড়ির বড়ো ছেলে হওয়ায় খুব কম বয়সেই অতি সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে উপার্জনের চেষ্টায় আমাকে বেরোতে হয়েছিল।

গত শতকের ছয়-এর দশকের মাঝামাঝি ডায়মন্ডহারবারের প্রায় বারো মাইল দক্ষিণে কাকদ্বীপগামী রাস্তা থেকে প্রায় তিন মাইল পূর্বে একটি গ্রামে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত একটি স্কুলে আমি কাজ পেয়েছিলাম। মাইনে ছিল আটচল্লিশ টাকা প্রতি মাসে। এটা আমার পক্ষে হাতে স্বর্গ পাবার মতো ব্যাপার হয়েছিল। স্কুলের সেক্রেটারি আমাকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কোনো এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে ওবাড়ির বাচ্চাদের পড়াবার বিনিময়ে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল লোকালয় থেকে একটু দূরে একান্ত ভাবে জনহীন ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা ছোট্ট টালির কুঁড়ে ঘরে। সে বাড়ির আশে পাশে ছিল কয়েকটা তালগাছ, প্রচুর আমগাছ, একটা পুকুর আর দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত। রবীন্দ্রনাথের পোষ্টমাস্টার গল্প পড়তে গিয়ে চকিতে আমার নিজের ওই সময়কার দিনগুলির কথা মনে পড়ে যায়। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ যে কোনো তরুণের মতোই আমার দিন কাটত শুধু ভালো লাগা আর বিস্ময় নিয়ে। কোনো দৈন্য বা অভাববোধ আমার ছিল না। জামা কাপড় ছিঁড়ে গেলে তা যে আবার নতুন করে কিনতে হবে সে ভাবনা মনেই আসত না– আমি সূচসুতো নিয়ে সেলাই-এর উদ্যোগ নিতাম। স্কুল আর স্কুলের পরে বাড়িতেও বাচ্চাদের সঙ্গে পড়াবার ছলে মেলামেশা, থাকা খাওয়া কোনো চিন্তা তো নেই। এর বাইরে অবসর থাকলে আমি মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম, বাবুই-এর বাসা বানানো দেখতাম, রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে মাছরাঙাদের মাছ শিকার দেখা নেশায় পরিণত হয়েছিল।

রাত্রিতে একা থাকতে ভয় করত বলে আমারই বয়সি একটি ছেলে যে ওই বাড়িতে রাখালের কাজকর্ম করত, চাষবাসেও লাগত– আমার ডেরায় চলে আসত। তার নাম ছিল সুধীর, কিন্তু সবাই তাকে সুধ্‌রে বলে ডাকত। আসল নামের সংক্ষিপ্ত করে একটি 'এ' -কার যোগ করে উচ্চারণের রীতি এখনো পাড়াগাঁয়ে বহু জায়গায় রয়েছে। (শুনেছি দাদাঠাকুর তাঁর জীবনীকার শিষ্য ও সহচর নলিনী (কান্ত সরকার) - কে নলে বলে ডাকতেন।) সুধ্‌রে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিশেষ ধরনের গ্রাম্য উচ্চারণে আমার সঙ্গে গল্প করত, গান গাইত। শব্দের প্রথমে থাকা 'রা' বর্ণটির উচ্চারণ করত 'অ' বলে যেমন আন্না ঘর, অক্ত (রক্ত), আমকিষ্ণ (রামকৃষ্ণ)। এই ভঙ্গীতেই সে গাইত তার প্রিয় শ্যামা সংগীত– 'মা তোর কত রঙ্গ দেখবো বল'! নানান অঙ্গভঙ্গী করে খেমটা নাচ দেখাত, মেলা দেখে ফিরে এসে আমাকে খেউড় গেয়ে শোনাত। সে আমায় তামাক ও বিড়ি খাওয়া শিখিয়েছিল, 'শইলে'র পক্ষে মহাউপকারী তাড়িতেও আমার দীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু তার দেওয়া শিক্ষা দীক্ষা আমি গ্রহণ করতে পারিনি বলে হতাশ হয়েছিল। যাইহোক না কেন গভীর রাত্রি পর্যন্ত দুই সমবয়সীর নির্জন সংস্কৃতি-চর্চ্চা তখনকার দিনগুলি ভরিয়ে দিয়েছিল। বান্ধবহীন প্রবাসে সুধ্‌রে আমার ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছিল।

সময়ের বেশ আগে আমি ইস্কুলে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়তাম। সরু আলপথের দুধারে ধানখেত বা সবুজ খেসারি কড়াই-এর খেত, আকাশে দু'একটি নীলকণ্ঠ পাখি– এসব দেখতে দেখতে আমি এগিয়ে যেতাম । গ্রামের মূল বসতি থেকে দূরে দ্বীপের মতো ছোট্ট একটি জায়গা– তাতে কয়েকঘর মুচির বসবাস। ওদের বাড়ির পাশ দিয়েই রাস্তা। আমি কিছুই না দেখার ভান করে ওদের অতিশয় দরিদ্র জীবন-যাপন লক্ষ করে যেতাম, আর শুধুমাত্র জন্মের 'দোষে' এক শ্রেণির সুন্দর স্বাভাবিক মানুষ কীভাবে সমাজের বৃহত্তর অংশের দ্বারা নিগৃহীত ও অপমানিত হয় তা দেখে মনে কষ্ট পেতাম।

মুচিদের বাড়িগুলির কোনো একটি থেকে সকালের দিকে এক অদ্ভুত দর্শন শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড় পরা এক বৃদ্ধা দুহাতে দুটো লাঠি, কাঁধে একটা অত্যন্ত ময়লা ঝোলা নিয়ে আকাশের দিকে মুখকরে দুটি পা ফাঁক করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভিক্ষায় বেরোত! তার মুখটি থাকত হাঁ করা, দুটো দাঁত বের করা, মাথার চুলগুলো সম্পূর্ণ ছাঁটা। ওই বৃদ্ধাকে মা, মাসি, পিসি, দিদি বা ঠাকুমা বলে কেউ ডাকত কিনা জানি না। তবে কিছুটা কৌতুক, কিছু তাচ্ছিল্য এবং খানিকটা অশ্লীলতার আভাষ মেশানো একটি নামে ওই এলাকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ওকে ডাকত–'ফেরকি'। আরশুলা ভরা কোনো অন্ধকার রান্না ঘরে হঠাৎ আলো জ্বেলে দিলে মুহূর্তের মধ্যে যেমন আরশুলাগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় সেরকম দূর থেকে ফেরকিকে আসতে দেখতে পেলে এলাকার সব বাচ্চা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ঘরে ঢুকে যেত। বাড়ির শিশুদের কান্না বা বায়না থামাবার জন্য লোকে বলত– ওরে, কে আছিস একবার ফেরকি কে ডেকে আন তো? দাদুরা নাতিদের সঙ্গে মস্করা করত, –তোর জন্যে ভালো মেয়ে ঠিক করেছি– ফেরকি! আমার ওই অসুন্দর বৃদ্ধার ওপর কেন জানি না বিশেষ মায়া পড়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে আমার চিররুগ্না মায়ের কোথায় যেন একটা মিল ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন, মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, আমি ওই কথার সঙ্গে আর একটু যোগ করতে চাই– মানুষ রিক্ত এবং নিঃস্ব না হলে সুন্দর হয় না। ফেরকি-কে দেখে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। দূর থেকে আমাকে দেখতে পেলে তার কুৎসিত মুখে এক স্বর্গীয় স্নেহ-ঝরা হাসি ফুটে উঠত। সুন্দরী রমণীর রহস্যময় হাসির চিত্রে কোটি কোটি মানুষ বিমোহিত হয়েছে, কতশত বই লেখা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে কোন কালজয়ী শিল্পীই ওই অসুন্দর বৃদ্ধার হাসির অপার্থিব উদ্ভাস আঁকতে পারবে না। এই অনাথিনী বৃদ্ধার অন্তরের কোন অন্তঃস্থল এ হাসির উৎস ছিল তা আমি আজও ভেবে পাই না।

প্রবল উৎসাহ নিয়ে আমি ইস্কুলে যেতাম। আমাদের বড়ো ইস্কুলের পাশেই ছিল 'ছোট্ট' প্রাইমারি ইস্কুল। সব মিলিয়ে আমরা জনাছয়েক শিক্ষক ছিলাম। বয়সে আমিই সবার ছোটো। আমি ছাড়া সকলেই ছিলেন স্থানীয়, অনেকেই সম্পন্ন গৃহস্থ। কম-বেশি চাষের জমি, সবজি খেত, গরুগাই, পুকুর, মাছ ইত্যাদি নিয়ে স্বচ্ছল গ্রামীণ সংসার। হামেশাই ওঁদের কারুর না কারুর বাড়িতে বিয়ে, মুখেভাত, নবান্ন, বা শীতলা পূজা প্রভৃতি লেগে থাকত, আমরা সকলেই আমন্ত্রিত হতাম– বেশ খাওয়া দাওয়া করে ফিরে আসতাম। শিক্ষকদের বসার ঘরে বেশির ভাগ সময়েই সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা, চাষবাস, বৃষ্টি-খরা, নৌকাডুবি, সাগরমেলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হত। ওইসব বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কম ছিল বলে আমি শুধুমাত্র শুনে যেতাম, বলার চেষ্টাও করতাম না। পাঠ্য বই-এর বাইরে ওখানে আর কিছু পাওয়া যেত না। আমি দাদের মলমের হ্যান্ডবিল বা ফকিরের রোগ নিরাময়ের কেরামতির বিবরণ, কিংবা রাস্তায় পড়ে থাকা টুকরো কাগজ যা পেতাম তা-ই পড়তাম।

এইভাবেই এক সহজ সরল নিস্তরঙ্গ জীবনে অনুষ্টুপ গতিতে এগিয়ে চলেছিলাম। আমার কোনো উচ্চাকাঙক্ষা ছিল না, আমি পরম সুখে এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু এই সুখ বেশিদিন সইল না। একদিন এক সহকর্মীর সঙ্গে কোনো এক সামান্য বিষয় নিয়ে আমার তর্ক বেধে ছিল। ভদ্রলোক অধিক বয়সের সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে আমার কোনো যুক্তিই গ্রাহ্য করছিলেন না। বরং আমার কথার ভুল অর্থ করে মনে করেছিলেন আমি তাঁকে অপমান করেছি। তিনি আমার জাতি পরিচয় জানতেন। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি অবান্তর ভাবে বারে বারে বলতে থাকলেন 'তোমার মতো ছোটো জাতের লোকের কাছ থেকে বেশি কী ভদ্রতা আশা করব?' প্রকৃতপক্ষে সংশোধন অসাধ্য আমার জাতি পরিচয় নিয়ে আমার কোনো বিকার ছিল না, কখনো সখনো কিছু বিড়ম্বনায় পড়েছি, কিন্তু চুপচাপ সরে আসা ছাড়া এ নিয়ে কোনো বিতর্কে আমি যাইনি। কিন্তু সেদিন আমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটল– আমি বলে ফেললাম, 'জানেন আমাদের জাতকে ছোটো বলায় একদিন শরৎচন্দ্রকেও ক্ষমা চাইতে হয়েছিল?' 'আমি ভাবতেই পারিনি যে এই কথাগুলি আমার মৃত্যুবাণ হয়ে ফিরে আসবে। তিনি বললেন 'মানে?' আমি তাঁকে মানে বোঝাবার চেষ্টা করলাম– এর মধ্যে অন্যান্য সহকর্মীরাও জড়ো হয়েছে। সকলের চোখে মুখে অবিশ্বাস যেন ফুটে বেরোচ্ছে। তাঁরা যখন জানতে পারলেন আমি কোনোভাবেই চিঠি দেখাতে পারব না, তখনই শুরু হল দুর্ভোগ! একজন তো বলেই ফেললেন, 'তোমার দাদুকে চিঠি লেখা ছাড়া শরৎচন্দ্রের আর কাজ ছিল না!' অনেক পরে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকে মোড়ল মশাই-এর মুখে এরকমই একটি উক্তি শুনেছিলাম।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না, ওঁরা প্রতিদিনই সুযোগমতো আমাকে উত্যক্ত করতে থাকলেন। আমি এখন বুঝতে পারি সেই সময়

গ্রামের শান্ত সহজ নিস্তরঙ্গ জীবনে মজা করার বা পাবার মতো কোনো বিষয় সহজলভ্য ছিল না, আমি 'মিথ্যাকথা' বলে বেশ সংকটে পড়েছি– এটাই তাঁদের কাছে বেশ উপভোগের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। আমার বয়সটাই আমার পক্ষে ছিল বিপজ্জনক। এবয়সেই লোকে তিলকে তাল দেখে, সামান্য বাপারেই মনের কষ্টে আত্মহত্যা করে, মা-বাবার বকুনিতে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। আমি আমার বন্ধুদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করে দাপটের সঙ্গে থাকতে পারিনি। লজ্জা আর সংকচে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে থাকলাম, মনের সব শান্তি উবে গেল। 'শুধু অকারণ পুলকে' সবুজ মাঠের পাশে ঘুরে বেড়ানো, মাছরাঙার শিকার দেখা– সবই বন্ধ হয়ে গেল। আমার প্রিয় বন্ধু সুধ্রের সঙ্গে সারারাত ধরে সংস্কৃতিচর্চা, এমনকী খাওয়া দাওয়াও বন্ধের মতো হয়ে গেল। সুধ্রে আমার কী হয়েছে ধরতে না পেরে একদিন এক গুণীন ডেকে আনল– তারপর স্বাভাবিক ভাবেই বকুনি খেল। দেরি করে ইস্কুল যাওয়া, আর তাড়াতাড়ি ফেরা, ইস্কুলে অযথা ছাত্রছাত্রীদের ওপর চড়াও হওয়া– এসব দোষ দেখা দিতে থাকল। আমি ঘরে ফিরেই কুকুর কুন্ডলী হয়ে চোখ মুখ ঢেকে শুয়ে পড়তাম। ভাদ্র সংক্রান্তিতে ওঅঞ্চলে বহু বাড়িতে রান্নাপূজো চলছিল। আমাদের প্রধান শিক্ষক ভান্ডারী বাবুর বাড়িতেও উৎসবের আকারে এই পুজো হত– আমরা সকলেই নিমন্ত্রিত হয়ে খেতে যেতাম। সে বছর ভাণ্ডারীবাবু প্রবল কৌতুকে উচ্চৈস্বরে আমার নিমন্ত্রণ করলেন, 'ওহে শরৎচন্দ্র, আসা চাই কিন্তু।' বলা বাহুল্য আমার পেটের অসুখ হল, আমি আর গেলাম না! রাস্তাঘাটে বেরোতে লজ্জা করত, স্নানের ঘাটে বহু মানুষের সমাগম– তাই আমি স্নানও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মনে হত আকাশ বাতাস গাছপালা সকলেই আমায় নিয়ে হাসাহাসি করছে! আমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, স্বর্গীয় দাদামশাই– সকলের ওপর একটা অভিমান ভরা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়ে গেল। আমার বেঁচে থাকাটাই দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

তখন শরৎকাল। একদিন সকালে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে– তারপর ঝলমলে কাঠফাটা রোদ উঠেছে। কালিদাস শরতের মেঘ-রোদ্দুরের এই খেলাকে শিশুর হাসি -কান্নার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আমি মৃদুপদক্ষেপে ইস্কুলের দিকে চলেছি– অত্যন্ত অনিচ্ছায়, হয়তো ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় অপরাধী মানুষটিরও এরকমই মনের অবস্থা হয়। আমি মুচিদের বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখলাম একটু দূরে একটা গাছের ছায়ায় একটি ঢিপির ওপরে ফেরকি বসে আছে। তার দুপাশে দুটো লাঠি শোয়ানো। আমাকে দেখে সেই স্বর্গীয় আভাযুক্ত নীরব হাসি। একটু দুরে রোদ্দুরে একটা কাঠের পিঁড়ির ওপর সামান্য কয়েকটা কাপড় চোপড়, একটা লাল ঝুমঝুমি। বর্ষার পর প্রায় বাড়িতেই এরকম একটি সমারোহময় অনুষ্ঠান ঘটে– বাক্স-পেটরা থেকে জামাকাপড় বের করে রোদ্দুরে দেওয়া– ন্যাপথলিনের গন্ধে আশপাশ ভরে যায়। একটা মরচে ধরা পুরনো সুটকেস জামাকাপড়ে পাশে খোলা রয়েছে। একটুদূরে একটা লালচে খবরের কাগজ টার চেহারা ও দোমড়ানো দেখে বেশ বোঝা যায় এটি ওই সুটকেসে পাতা ছিল– হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পাশের জল-কাদায় পড়ে গেছে। আমি কৌতুহল বশত ওই জলকাদা লাগা কাগজটি তুলে দেখলাম– ওটি বহুদনি পূর্বে বিলুপ্ত দৈনিক পত্রিকা 'ভারত' -এর একটি পাতা, অন্তত কুড়ি বছর আগে তারিখ দেওয়া। বুঝতে অসুবিধা হয়নি, বহু বছর আগে এই কাগজটি ফেরকি জোগাড় করে সুটকেসে পেতে রেখেছিল, তারপরে ওটি পালটাতে পারেনি বা উপায়ও ছিল না পালটাবার।

আন্দামান দ্বীপমালা হিমালয় পর্বতমালার ওপরে বসে রয়েছে, মহাকাশ থেকে একটি উল্কা ছুটে এসে পৃথিবীতে এমনই পড়েছিল যে তার অভিঘাতে কাস্পিয়ান সাগর তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এসব সত্যি কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, সব বিস্ময়ের সীমা পার হয়ে যায়। সেদিন সেই প্রখর রৌদ্র দগ্ধ শরৎ প্রভাতে নির্জন কর্দমাকীর্ণ পল্লিপথে এরকমই একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল। সেই কর্দমলিপ্ত ছিন্নপত্রটি বহু বছর ধরে এ অস্পৃশ্য ভিখারিনির সামান্য সম্বল আগলে রেখেছিল। তারপর চিরতরে মাটিতে মিশে যাবার আগে মুহূর্তে লজ্জা আর অপমানে মাটিতে মিশে যাওয়া এক সংসার অনভিজ্ঞ অপোগন্ড নির্বোধকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

আমি জলে ভেজা কাগজটির পরের পৃষ্ঠা উলটালাম। সেখানে ছোটো বড়ো যথাযথ হরফে সাজানো একটি লেখায় আমার দুই চক্ষু স্থির হয়ে গেল।